Ekhon Bhabana – Prabandho – Others – Banshanu Paribartita Shasya – Samajik Prabhab O Satarkata – Amitabha Gangopadhyay

এখন ভাবনা - বংশাণু পরিবর্তিত শস্য - সামাজিক প্রভাব ও সতর্কতা - অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

'Technology is created in response to market pressure not for the need of poor people.' –UNDP.

বাজারের প্রয়োজনেই বোধহয় প্রযুক্তি বিকাশের নতুন ধারার শেষতম সংযোজন কৃষিতে বংশাণু পরিবর্তনের জন্য জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার। এই নতুন প্রযুক্তিটি প্রকৃতির সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলকে বিনষ্ট করে ভোক্তার অন্তহীন চাহিদাকে চরিতার্থ করতে চলেছে। বহুজাতিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে শস্যবীজের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য জীবের ওপরও এই প্রযুক্তির পরীক্ষা - নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বংশাণুগত পরিবর্তিত জীব (Genetically Modified Organism) বা সংক্ষেপে জি.এম. ও।

বংশাণু পরিবর্তিত জীবন বা জি. এম. ও কি তা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যাক। জৈব প্রযুক্তি ও বংশাণু প্রযুক্তির জনানা পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা কোনো কোনো প্রজাতির কোনো বিশেষ গুণসম্পন্ন বংশাণু (জিন) চিহ্নিত ও নিষ্কাষণ করে অন্য প্রজাতির ক্রোমোজমের ডি. এন. এ. (ডি-অন্টিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) তন্তুতে সংস্থাপন করছেন। ঐ সংস্থাপিত জিন নতুন জীবের কোষে প্রকাশিত হয়ে চাহিদানুযায়ী ঐ বিশেষ চরিত্রের (গুণ) বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে - এই নতুন উদ্ভাবিত জীবটি ট্রান্সজেনিকজীব বা জি. এম. ও। জীব বিদ্যার ভাষায় কোষের জিন মানচিত্রে পরিবর্তন, সংযোজন বা প্রতিস্থাপন করলে তাকে পৃক্ত জিন (মডিফায়েড জিন বা ট্রান্স জিন) বলে। যেমন আধপাকা ফল গাছ থেকে পাড়ার পর তাড়াতাড়ি পেকে গিয়ে নষ্ট হওয়া রোধ করতে এমন জিন তাতে প্রতিস্থাপিত করা হয় যা সাময়িকভাবে পচনরোধ করবে। এইভাবেই বংশাণুপ্রযুক্তির সুচারু প্রয়োগে উচ্চফলনশীল, রোগ পোকা সহনশীল বেশি পুষ্টিমূল্যের শস্য, অধিক মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী গবাদি পশু, জীবনদায়ী ওষুধ (ইমিনোগ্লোবিন, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ইত্যাদি) উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। আবার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করছে টার্মিনেটর বীজ বা আত্মঘাতী বীজ। অর্থাৎ বীজ থেকে যে ফল হবে তার থেকে নতুন বীজ আর পাওয়া যাবে না। কৃষকদের চাষের জন্য প্রতিবারঐ প্রতিষ্ঠানের বীজ কিনতে হবে কেননা, সেই বীজের ওপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের পেটেন্ট নেওয়া আছে। প্রাণিদেহের ওপর এই জিন পরিবর্তিত শস্যের বা প্রাণিজাত খাদ্যের কুপ্রভাব নিয়েও গবেষণা ও বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকেই বলেছেন এই জিন পরিবর্তিত জীবজাত খাদ্য সমাজে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

আমাদের দেশে বংশাণুগত পরিবর্তিত শস্যের (Genetically Modified Crop) ব্যবহার ও গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ঃ-

২০০২ -এরর মার্চে ভারত সরকার প্রথম জি. এম. শস্যের বাণিজ্যিকভাবে চাষের অনুমোদন দেয়। মহারাষ্ট্র হাইব্রিড বীজ কোম্পানি (মাহিকো) ব্যাসিলাস থুরিন জেনসিস (ছদ্ধ) নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে নেওয়া জিন সংস্থাপিত তুলোর তিনটি জাত বাজারে বিক্রির অনুমতি পায়। তাদের দাবি এতে তুলোর কীটশত্রু কটন বলওয়ার্মের আক্রমণ তো হবেই না উপরন্তু ফলন হবে প্রায় তিন গুণ। প্রসঙ্গত বলা যায় জি. এম. শস্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটা কমিটি আছে। গবেষণাগারে গবেষণাসমূহ অনুমোদন করে "Institutional Biosafety Committee" । Genetic manipulation Review Committee শস্যক্ষেতে পরীক্ষা - নিরীক্ষার অনুমোদন দেয়। বাণিজ্যিকভাবে জি. এম. শস্য বিক্রির অনুমতি দেয় কেন্দ্রিয় সরকারের পরিবেশ দপ্তরের অধীন Genetic Engineering approval Committee। হায়দ্রাবাদে ICRISAT (Inter National Crop Research Institute for Semi Arid Region) নামক আন্তর্জাতিক সংস্থায় ট্রান্সজেনিক মটর (জিন সংস্থাপিত মটর) নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা করা হচ্ছে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে নটেশাক থেকে জিন নিয়ে আলুতে সংস্থাপন করে অধিক পুষ্টিমূল্যের আলু তৈরির চেষ্টা চলছে। এখানকার বিজ্ঞানীরা ভিটামিন A যুক্ত স্বর্ণধান (গোল্ডেন রাইস) তৈরির চেষ্টাও করেছেন।

অন্য দেশে জি. এম. শস্যের গবেষণার বর্তমান অবস্থা ঃ-

জি. এম. শস্য নিয়ে গবেষণায় পথিকৃৎ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার গবেষণাগারেও নানারকম শস্য ও প্রাণির জিন মানচিত্র পরিবর্তন করে জি. এম. ও তৈরি করা হচ্ছে। জি . এম. ভুট্টা আর সয়াবিন রপ্তানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ ডলার মুনাফা করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ চিনও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ইতিমধ্যেই এই দেশ ৩০ রকমের জি. এম. শস্য অনুমোদন করেছেন। সেখানে ৭০ হাজার হেকটর জমিতে বিটি (ছদ্ধ) তুলোর চাষ হয়েছে 'Science' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে আছে 'China is developing largest plant Biotechnology capacity outside of North America'।

চিনের ২০০টি জৈব প্রযুক্তি গবেষণাগারে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) কর্মী নব্বইটি শস্য নিয়ে কাজ করে চলেছেন। ফুজিয়ান আকাদেমির বিজানী ওয়াং ফেং চায়না ডেলি পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন "If we do not boldly push ahead with our GM technologies we will never have our own Monsanto or Syngenta (Biotech Farm)" । তবু চিনে জি. এম. শস্যজাত খাদ্যের প্রসারে প্রতিবাদ করছেন মানুষ। শঙ্কিত মানুষ নানাভাবে প্রতিরোধের পথ বেছে নিচ্ছেন। তাঁদের আশঙ্কা জি. এম. ফসল ব্যবহারের ফলে মানুষ ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্যহানি সম্ভাবনাকে ঘিরে যা পরে আলোচিত হবে।

জি. এম. শস্য প্রসার ও বিপণনে বহুজাতির সংস্থার আগ্রাসী পদক্ষেপ ঃ-

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেল্টা পাইন কোম্পানি এবং United States Department of Agriculture (USDA) যৌথভাবে জৈব প্রযুক্তি সংক্রান্ত একটি পেটেন্ট নিয়েছে (US Patent No 5723765 dated 3.3.98)- এর শিরোনাম ' Control of Plant Gene expressin'। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন বীজ তৈরি হচ্ছে নিজের ভ্রূণ সে নিজেই নষ্ট করবে অর্থাৎ 'আত্মঘাতী বীজ' (terminator Seed)। কানাডার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Rural Advancement Foundation International (RAFI) এই প্রযুক্তি। এর ফলে কৃষকেরা বীজ থেকে আবার বীজ তৈরি করার বহুদিনের অধিকার হারালেন। এই শেষ নয় মনস্যান্টো নামে বহুজাতিক সংস্থা (যার খ্যাতি ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকায় ব্যবহৃত এডেন্ট অরেঞ্জ নামক মারাত্মক মারণ বিষ তৈরিতে) তারা ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস (Bt) ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ জিন ভুট্টা, সয়াবিন, ধান, তুলো ইত্যাদি শস্যের জিনসজ্জায় স্থাপন করছে। তাদের দাবি এতে ঐ সমস্ত শস্যে এমন কীট প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হবে যার জন্য পরিবেশ ধ্বংসকারী রাসায়নিক বিষের ব্যবহারও কমে যাবে। কিন্তু পরিবেশের অন্যান্য জীবের ওপর ঐসব Bt শস্যের বিষাক্ত কোষের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা না পরীক্ষা কবেই মুনাফালোভী বহুজাতিক কোম্পানিটি ঐ শস্য বাজারে বিপণনের জন্য এনেছে। সমাজের উপকার না হয়ে এতে ক্ষতিই হল। সম্প্রতি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 'নেচার' পত্রিকায় জীবের ওপর বিটি প্রযুক্তির প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে দেখিয়েছেন মনার্কজাতের প্রজাতির শূককীটরা মিল্কউইড নামক এক জাতের পাতা ভক্ষণের পর মারা যাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐ সমস্ত পাতার ওপর Bt ভুট্টার রেণু পড়েছিল। যে সমস্ত পাতার ওপর ঐ রেণু পড়েনি তার পাতা খেয়ে শূককীটগুলো দিব্যি বেঁচে ছিল। অতএব পরিবেশর ওপর ছদ্ধ শস্যের প্রভাবের এক জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া গেল। Bt শস্যের রেণু যতদূর ছড়িয়ে পড়বে ততখানিই হতে পারে উপকারী পতঙ্গ মৌমাছি, বোলতা, ঘাসফড়িং এবং কাঁচপোকা ইত্যাদির মৃত্যু এলাকা। ফসল দূষিত করতে পারে যার জন্য মারা পড়তে পারে জল ও মাটির জীব কুল। এই সম্পর্কেও ক্রেচ্চিও ও স্তোজকি নামে দুটি বিজ্ঞানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন।

আরও উদাহরণ আছে। ১৯৯৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রায় পাঁচশো তুলোচাষী আত্মহত্যা করেন। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে ব্যাপক পোকা লাগার জন্য সেই বছর তাদের ছদ্ধ তুলোর ফলন প্রায় ৯৫ শতাংশ কমে গিয়েছিল। অথচ বীজ বিক্রয়কারী বহুজাতিক সংস্থা বলেছিল, ফসলে পোকা তো লাববেই না উপরন্তু ফলন হবে সাধারণ তুলোর প্রায় তিন গুণ। হতভাগ্য চাষিরা মোহে ভুলে তুলো চাষের জন্য মহাজনের কাছে নেওয়া ঋণ আর শোধ না করতে পারায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

আরও একটা মারাত্মক ঘটনার উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। ১৯৯৭ সালে প্রায় গোটা ইউরোপে, আমেরিকা থেকে গো - খাদ্য হিসেবে Bt ভুট্টা আমদানি না করার জন্যে প্রবল আন্দেলন হয়েছিল। কারণ গো - খাদ্য ঐ Bt ভুট্টার ব্যবহারে গরুর শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক সহনশীল মার্কার জিন ব্যবহার করা হয়), সেজন্য গরুর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়েটিক ওষুধে কাজ না হওয়ার প্রচুর গরু মারা পড়ছিল। এছাড়াও Bt ভুট্টা খাদক গরুর দুধ দীর্ঘদিন পান করলে মানুষের শরীরেও অ্যান্টিবায়েটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে যার ফলে রোগের ওষুধ ব্যবহারে জটিলতা সৃষ্টি হবে। ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এই মর্মে সে দেশের সরকারকে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে জি. এম. শস্য (বিটি ভুট্টা ইত্যাদি) যাই হোক শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯সালে মানুষের আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। Bt ভুট্টার আমদানি ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে নিষিদ্ধ হয়।

জি. এম. শস্যের অশুভ প্রভাবের আশংকায় দেশে দেশে প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের ঢেউ ঃ-

জি. এম. শস্য ব্যবহারের ফলে কৃষক ও ভোক্তার চাহিদা মতো উপকরণ ও উৎপাদিত ফসল ও ফসলজাত খাদ্য নির্বাচনের অধিকার থাকছে না, মানুষের ক্যানসার, অ্যালার্জি

ইত্যাদি স্বাস্থ্যহানিকর রোগব্যধি, গবাদি পশুর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি, জি. এম. শস্যের বীজের অত্যধিক দাম ও প্রতিশ্রুতি মতো ফলন না পওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এই শস্যচাষের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সচেতন মানুষ আন্দোলনে নেমেছেন। অন্যদিকে কার্গিল, মনসান্টো, ডুপন্ট ও নোভার্টিসের মতো বহুজাতিক কোম্পানি বিশ্বের বিভিন্ন দেসের সরকারকে কব্জা করে তাদের বাজারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, জি. এম. শস্যের বিরুদ্ধে জনসচেতনার আন্দোলন শুরু হয় কানাডায় রফিক [RAFI, (Rural Administrative Foundation International)] নেতৃত্বে। ক্রমশ আর্থ ফাস্ট, জেনেটি' অ্যালার্ট, গ্রিনপিস, ফ্রেন্ড স অফ দা আর্থ, নেরাজ (NERAGE) প্রভৃতি অসরকারি সংস্থা (NGO) উত্তর আমেরিকাজুড়ে সেই আন্দোলন বিস্তৃত করে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে জাপানে, সেখানে জনগণের দাবি ছিল জি. এম. প্রযুক্তিজাত সমস্ত খাদ্যের মোড়কে লেবেল লাগানো বাধ্যতামূলক করতে হবে যাতে কেনার সময় ক্রেতা বুঝতে পারেন তিনি কী রকম (জি. এম. প্রযুক্তিজাত অথবা সাধারণ) খাদ্য কিনছেন। ১৯৯৭ সাল থেকে জাপানের সবচেয়ে বড় খাদ্য তৈরির সংস্থা তাই শি শকুহিন 'জিন প্রযুক্তি মুক্ত খাদ্য' এই লেবেল লাগিয়ে খাবার বিক্রি শুরু করে। তাকে অনুসরণ করে আরও কিছু সংস্থা। আমেরিকা থেকে জি. এম. ভুট্টা আমদানি কমে যেতে আমেরিকার চাষিরাও ঐ শষ্য চাষ থেকে সরে আসতে থাকে। নিউজিল্যান্ডের ওয়াইল্ড গ্রিন নামে একটি অসরকারি সংস্থার সক্রিয় কর্মীরা ক্রাইস্ট চার্চের কাছে জি. এম. আলুর খেত পুড়িয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানান। মেকসিকোতে জৈব প্রযুক্তিজাত ভুট্টা নিষিদ্ধ হওয়ার পরও সরকারি স্তরে দুর্নীতির সুযোগে চোরাপথে মানসান্টে ও তার সহযোগী সংস্থাগুলি ঐ ভুট্টার বীজ সেখানে প্রবেশ করাতে থাকলে জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ভারতবর্ষেও এই ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে। মানুষ বুঝতে পারছেন প্রকৃতিকে নিংড়ে ছিবড়ে করে দেওয়া মুনাফা শিকারী বহুজাতিকের ধ্বংসকারী দর্শনকে। তাদের মনের মাঝে আছে সেই দর্শনের স্নিগ্ধ অনুভূতি -

'না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায়ে মোরে।'

'অতি - ইচ্ছার' চাহিদা মেটাতে প্রকৃতির সাজানো জিন মানচিত্র বদলে ফেলে বহুজাতিক কোম্পানি দরিদ্র মানুষের জন্য নাকি অধিক পুষ্টিমূল্যের খাদ্য তৈরি করবে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন জি. এম. শস্যের বীজ, টার্মিনেটর জিন সংস্থাপিত বন্ধ্য বীজ আমাদের চাষিদের সর্বনাশ করবে। বীজের জন্য দেশ বহুজাতিকের নির্ভরশীল হবে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। যদিও আমাদের দেশে সরকারি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা সবজি, ধান ইত্যাদির ওপর জিন পরিবর্তন করে নতুন জি. এম. চাষের জন্য গবেষণা চলছে। তা হলেও সতর্কতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। মানুষের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে তা অবশ্যই প্রয়োজন। সারা বিশ্বের জি. এম. শস্য বিরোধী আন্দোলনকারীরা বলছেন "Cartegena Biosafety Protocal" মেনে আমদানিকারী দেশই ঠিক করবে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো শস্য কোনো দেশ নিজের দেশে ঢুকতে দেবে কিনা। আমেরিকার অবশ্য এই ব্যাপারে প্রবল আপত্তি ও চাপ রয়েছে। শেষ অবধি বলা যায় কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষই ঠিক করবেন সুস্থ পরিবেশের স্বার্থে, সুস্থ জীবনের স্বার্থে বিজ্ঞানের কোন ফলটিকে তারা গ্রহণ করবেন কোনটিকেই বা তারা বর্জন করবেন। বহুজাতিক কোম্পানিগুলি আর তার পৃষ্টপোষক দেশগুলো কখনোই এই ব্যাপারে শেষ কথাটা বলতে পারে না।

সূত্রঃ

১। The Terminator Technology for Seed Production and Protection: Why & How? P.K. Gupta, Current Science Vol 75 No. 12, 25 December, 1998.
২। লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি - দেবল দেব।
৩। আজকাল পত্রিকা, ২২শে আগস্ট, ১৯৯৯।
৪। Special Report G M Crop – The Hindu.
৫। The Future of GM Food, John Feffer – The Statesman, 5/12/04.
৬। বিভিন্নপত্রপত্রিকা।

Ekhon Bhabana – Prabandho – Others – Sukumarer Aboltabol – Mohya Chattopadhyay
এখন ভাবনা - সুকুমারের আবোলতাবোল - মহুয়া চট্টোপাধ্যায়

সুকুমার রায় নামটা শুনলেই 'ছোটদের জন্য', 'মজার, 'হাল্কা ধরনের', 'হাসি'র...ইত্যাদি শব্দগুলি মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। 'বড়ো'রা বসে বসে সুকুমার রায় পড়ছে - এটা শুনতে বা দেখতে আমর বোধহয় খুব একটা অভ্যস্ত নই। কিন্তু সুকুমার রায় ছোট-বড়ো সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার যথেষ্ট রসদ রেখে গেছেন তাঁরা লেখা ও আঁকার মধ্যে। তাই তাঁর সৃষ্টিকে কখনোই কয়েকটা বিশেষণের পরিমিতিতে সীমায়িত করা যায় না। তাঁকে বোঝবার জন্য যা দরকার তা হল 'খেয়াল রসে'র প্রকৃত ভোক্তা। যারা এই রসে বঞ্চিত, যারা উদ্ভটত্বের মর্ম বুঝতে অক্ষম, তাদের জন্য 'আবোল তাবোলে'র দরজা খুলবে না। এই 'ভুলের ভবে' প্রবেশের জন্য ছাড়পত্র দাখিল করতে হবে। তাঁর লেখার অর্থ 'বেবাক লোক' বুঝুক বা নাই বুঝুক, এটুকু আমরা বুঝেছি যে, তাঁর লেখা মূলত শিশুদের জন্য হলেও তার আড়ালে লুকিয়ে আছে নিগূঢ় কোনো তত্ত্ব যা 'সর্বজনবোধ্য বা সহজপাচ্য' নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর কবিতাগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' এক অতি-পরিচিত গ্রন্থনাম। এর প্রায় প্রতিটি কবিতায় একে একে হাজির হয়েছে আজব সব চরিত্র, যারা আকারে - প্রকারে বিচিত্র, উদ্ভট তত্বে বিশ্বাসী এবং উৎকট সব বাতিকে আক্রান্ত। তাদের এই স্বভাবের জন্য তারা আবার এক পর্যায়ভুক্তও বটে। এইসব চরিত্রের মধ্যে সুকুমার রেখেছেন এক সাধারণ ধর্ম। এদের প্রত্যেকের মনে আপশোস - কেউ তাদের কথা শোনে না, বোঝে না। তারা যতই অচেনা জগৎকে সবার সামনে তুলে ধরুক, যতই নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করুক, যতই গভীর তত্বের সন্ধান দিক, শেষ পর্যন্ত, শ্রোতা নিরুৎসাহই থাকে। 'রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজায়' বসা রাজা বা 'হেড আফিসের বড়বাবু' কিম্বা 'ছায়াবাজি'র ব্যবসাদার বা 'ফুটোস্কোপে'র আবিষ্কর্তা, অথবা 'চন্ডীদাসের খুড়ো', 'হাতুড়ে' ডাক্তার, কাষ্ঠতত্ত্ববিদ 'কাঠবুড়ো' বা 'বুঝিয়ে বলা'র তত্ত্বজ্ঞানী - কেউই পাত্তা পায় না আদতে। কারোরই অযাচিত পরামর্শে কান দেয় না বধির জগৎ। তাই এরা কখনো রেগে যায়, কখনো কেঁদে ফেলে, কখনো দুঃখ পায় আবার কখনো বা বিরক্ত হয়। এই দৃশ্য দেখা যায় তাঁর কাঠবুড়ো, গোঁফচুরি, কাতুকুতুবুড়ো, কুমড়োপটাশ, ছায়াবাজি, চোরধরা, বোম্বাগড়ের রাজা, বিজ্ঞান শিক্ষা, সাবধান, বুঝিয়ে বলা ইত্যাদি আরো কবিতায়। বোঝা যায় সংসারে উদ্ভট তত্বে বিশ্বাসী বা উৎকট বাতিকগ্রস্ত লোকের অভাব নেই। তবু এদের মুখেই স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় অবুঝ, বধির জগতের বিরুদ্ধে এক বড়ো নালিশ।

সুকুমার রায় নিজেও যেমন সখেদে বলেছিলেন, 'আবোলতাবোল' বোঝা সবার কর্ম নয়, উদ্ভট রসের ভোক্তা সবাই হতেপারে না, তেমনি এই বই - এর নিরুপায়, নিঃসঙ্গ, রাগী - দুঃখী চরিত্রগুলোও নানাভাবে জানায় যে, জগৎ তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে আছে। তারা যতই বিচিত্র রহস্য ভেদ করুক, স্বেচ্ছায় বিশ্বের লোকের মঙ্গলচিন্তা করুক, শ্রোতার জ্ঞানস্পৃহার শোচনীয় অভাব আছে। তাদের মহামূল্য কথাকে কেউই বুঝতে পারে - না, আর আছে পারা আর বুঝতে - না - চাওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কি এমন আছে সুকুমারের লেখায় কেমন সেই অর্থের ব্যবহার যা সহজে কেউ বোঝে না, অথচ যা বাইরে থেকে সার্থক চিরন্তন শিশুপাঠ্য বলে গণ্য হয়ে আসে।

আসলে একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সুকুমার রায় সচেতনভাবে সযত্নে তাঁর কবিতার চরিত্রগুলিকে তৈরি করেছেন একটু আলাদা ধরনের উপকরণে। এরা সবাই চলে উল্টো মতো। অন্যেরা যতটা না এদের কথা এড়িয়ে চলে, বরং সেই তুলনায় এরা নিজেরা অতিরিক্ত জেদী, কোনো আপত্তির তোয়াক্কা করে না, কিন্তু চায় সবাই তাদের কথা বিনা তর্কে এক বাক্যে মেনে নিক। এই সর্বজ্ঞরা তার্কিকদের একদমই পছন্দ করে না। তারা নিজেদের মনে করে সবজান্তা এবং তাদের ধারণা, তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকা সত্যের নড়চড় হলেই বিশ্ব - সংসার রসাতলে যাবে। এক সংকীর্ণ একমাত্রিকতায় আক্রান্ত তত্ত্ববিদ্দের জ্ঞানের সীমা এমন নিখুঁতভাবে মাপা, যে তার পরিসরে হ্রাস - বৃদ্ধি বা 'ছকের বদল অসম্ভব'। সেই ছকের চৌহদ্দির বাইরে যা পড়ে তাই তাদের মতে অবান্তর, অযৌক্তিক। এই সমস্ত আত্মকেন্দ্রিক তত্ত্বজ্ঞানীদের স্থির বিশ্বাস, তারাই কেবল অগতির গতি। জগতের ব্যর্থ, হতভাগ্যদের তাদের দ্বারস্থ হতেই হবে। তাদের জ্ঞান এবং কর্তৃত্বকে নির্বিবাদে, নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ক্ষমতার খেলা। তাদের মেনে নেওয়া মানেই নিজস্ব বুদ্ধিচিন্তা, স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে তাদের অধীনস্থ হয়ে যাওয়া। তাত্ত্বিকদের জ্ঞানের যাথার্থ্যকে মেনে নেওয়ার আর এক অর্থ তাদের ক্ষমতার যথার্থ্যকেও মেনে নিতে হবে, কেননা ক্ষমতা ও জ্ঞান পরস্পর জড়িত, অবিচ্ছেদ্য। ক্ষমতার লোভ কেইবা ছাড়তে চায় ? আর এখান থেকেই বোঝা যায়, অবুঝ জগতের অপার ঔদাস্য দেখে সুকুমারের চরিত্ররা কেন রেগে ওঠে।

বক্তব্যের গভীরতায় পৌঁছনোর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুকুমার রায় 'ননসেন্স' শব্দ ও ক্রিয়াকে ব্যবহার করেছেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আঘাত করার জন্যই। সুতরাং পাঠকের উপলব্ধির মূল্য এখানে খুবই বেশি, নাহলে প্রকৃত বোদ্ধার অভাবে সুকুমার সাহিত্য শুধুমাত্র শিশুপাঠ্য হয়েই সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ থাকত। বিশ্বজনীন আবাল - বৃদ্ধ - বনিতার প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠত না।

এখন প্রশ্ন 'ননসেন্স' কী এবং সাহিত্যবর্গ হিসেবে সুকুমার রায় এটিকেই বেছে নিলেন কেন ?

ইংরেজ সাহিত্যতত্ত্ববিদ জে . এ. কাডন তাঁর সম্পাদিত Dictionary of Literary Terms - এ বলেছেন ননসেন্সে অর্থহীন কল্পনার অবাধ প্রসার, পার্থিব জগতের বাধা এক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়, তাই বাস্তব আর অবাস্তব দুই - ই সমমূল্যে সমাদৃত। বাস্তব বলতে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নয়, যা সম্ভাব্য - অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে তা-ই বাস্তব। আর গল্পের অবাস্তব হচ্ছে যা কোনোদিন ঘটেনি, ঘটছে না ও ঘটবে না।

এই অবাস্তবের মধ্যেই পড়ে নীতিগল্প, রূপকথা, অতিশয়োক্তিমূলক গল্প, অলৌকিক গল্প, বাতেল্লা প্রভৃতি, চরিত্র - বৈশিষ্ট্যে এরা একি অপরের থেকে আলাদা এবং কোনোটাই প্রকৃত ননসেন্স হয়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে জে. এ. কাডনের কথাতেই বলা যায়) Pure nonsense is entirely dependent on the rejection of what most people consider logical or even normal and an acceptance of the conventions of a completely different universe. [Dictionary of literacy terms, ed. J. A. Cuddon, 3rd edn. P-588].

অতএব অবাস্তবের আর এক প্রকার উদ্ভট, আজগুবি, ননসেন্স। এ আকারে বৃহৎ এবং এর বৈচিত্র্যও অনেক। প্রাথমিক ভাবে যা যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ বহন করে না তাকেই ননসেন্সের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এর আবার দুটি স্পষ্ট বিভাগ আছে - অর্থহীন ও অর্থবাহী। শব্দ, অর্থ, বাক্য এবং বাক্যের বিভিন্ন রকম সজ্জার ফলে তৈরি হল ননসেন্সের নতুন নতুন উদাহরণ। এইভাবেই তৈরি করেছিলেন সুকুমার রায় হাঁসজারু, বকচ্ছপ, হাতিমি, কুমড়োপটাশ বা হিজিবিজবিজদের। অর্থহীন একাধিক শব্দের মধ্যে ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদি বসিয়ে সৃষ্টি হয় চমৎকার ননসেন্স কবিতা। এই ননসেন্সের সব থেকে বড়ো সম্ভার ছন্দোবদ্ধতা। এই ছন্দের সাযুজ্য বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে, এগুলো ননসেন্স বলেই এখানে শব্দের অর্থবহতার শর্ত উপেক্ষা করা সম্ভব হয়। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছোটদের ছড়া বা নার্সারি রাইম। বড়দের জন্য অর্থহীন শব্দের ব্যবহার অবশ্যই কেবলমাত্র কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য নয়। তার আড়ালে থাকা অর্থটির উপলব্ধিতেই ননসেন্স রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অর্থহীন ননসেন্সের গদ্যরূপে আবার অর্থহীন শব্দ প্রায় অনুপস্থিত। গল্প সামগ্রিক বা খন্ড দুই রূপেই অযৌক্তিক। গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিটি ভাগে, পর্বে নাকচ করা হচ্ছে, ফলে গল্প শেষ করেও কোথাও পৌঁছানো যাচ্ছে না। বিভিন্ন স্তরে ননসেন্সের উপাদনগুলির অর্থাৎ অবাস্তব চরিত্র, ঘটনা ক্রিয়া, আবহ বা পটভূমি যত বেশি সংখ্যক অবাস্তব হবে ততই কাহিনী চূড়ান্ত, আদর্শ ননসেন্সে পরিণত হবে।

অর্থবাহী ননসেন্স ও কার্যকারণসম্মত অর্থবাহী নয়, বক্তব্যকে উপমা বা প্রতীকের ছদ্মবেশ পরানো হয়। এখানে যাকে অবাস্তব, অযৌক্তিক মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে তার অন্তর্নিহিত, যুক্তি বোঝাই হল পাঠকের কাজ। 'আবোলতাবোল' এর কবিতায়, হযবরল, পাগলাদাশু, দ্রিঘাংচু প্রভৃতি নাটক ও গল্পে সুকুমার রায় দেখাতে চেয়েছেন অসম্ভবের মধ্যে কোন যুক্তি আছে, বক্তব্য আছে। আপাত অসঙ্গতির আড়ালে কেমন সব জট পাকিয়ে আছে তা খুলে খুলে দেখায় এই ধরনের রচনাগুলো।

ছদ্ম কৌতুকের আবহে গভীর ও গম্ভীর সত্য, তথ্য ও তত্বের প্রকাশই ছিল সুকুমার রায়ের উদ্দেশ্য। তাঁর বাতিকগ্রস্ত, বাতুল ননসেন্স চরিত্রগুলোর আড়ালে এমন সব মুখ উঁকি মারে যারা বাস্তবে মোটেই হাসির উদ্রেক করে না। এরা কেবলমাত্র কাল্পনিক চরিত্রও নয়। আমাদের চারপাশের গম্ভীর, ভারিক্কি মেজাজের মানুষের আদলে গড়ে ওঠা এরা আমাদের চেনা মানুষ। এই ধরনের রচনার বিশেষত্ব এটাই যে বাস্তব বিশ্বের হুবহু নকল না করেও, বাস্তবের বিশ্বাসযোগ্য ছবিটাকে ধরা যায় এটা বাস্তববাদী শিল্পের বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি পরাবাস্তববাদীদের মতো, বাস্তব বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েও পুরোপুরি বাস্তব না হওয়া এবং বিপরীত ক্রমে, অবাস্তবতার আড়ালে গভীর বাস্তবের উপস্থিতির বিষয়টা তাদের শিল্পের দখলে। বাস্তববাদী ও পরাবাস্তববাদীর সংযোগ - অসংযোগে যে বিশেষ রীতিটি আমরা সুকুমারের সাহিত্যে পাই তা হলে 'ননসেন্স'- এর চমৎকার ব্যবহার। তাই ননসেন্সের আক্ষরিক অর্থ আদৌ অর্থহীন, খেলো, উদ্ভট শব্দের কার্য - কারণ সম্পর্কহীন যথেচ্ছ ব্যবহার নয়। সুকুমারের রচনার জগৎ ননসেন্সের সার্থক ব্যবহারে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও বাস্তবের

প্রতিস্পর্ধী এক স্বতন্ত্র পৃথিবী। তাঁর বিভিন্ন রচনায় ব্যবহৃত উদ্ভট শব্দগুলো ঠিক কোন্ বাস্তব প্রেক্ষিতের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তা বিশ্লেষণ করলেই সাহিত্যবর্গ হিসেবে ননসেন্স ব্যবহারের যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

সুকুমার রায়ের কবিতায় ব্যবহৃত যে অসঙ্গতি এক অর্থে যে কোনো হাসির প্রাণবস্তু - এই অসঙ্গতিই দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ায় ঔপনিবেশিক কলকাতার ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের আচার - আচরণের মধ্যে। আবোলতাবোলের ট্যাঁশগরু, বাবুরাম সাপুড়ে, নারদ নারদ, শব্দকল্পদ্রুম, কুমড়োপটাস তাকেই নিজস্ব রূপ দিয়েছেন সুকুমার। 'সাবানের স্যুপ' আর মোমবাতি চোর 'colonised' বাঙালি তুচ্ছ কারণে গায়ে - পড়ে - ঝগড়া করে, ক্রোধে অন্ধ হয়ে শুদ্ধ - অশুদ্ধ ইংরেজি বলে, উৎপাতহীন নিরীহ প্রতিপক্ষের ওপর জোর ফলিয়ে নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে চায়। তৎকালীন বাঙালি সমাজের এই নঞর্থক পরিণতি সুকুমার রায়কে বাধ্য করেছে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে, তার প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হাসতে। এই ঔপনিবেশিক মানুষ সবরকম আঁচ বাঁচিয়ে কোনোক্রমে টিকে থাকতে চায় এক নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ জগতে। বাস্তব - অবাস্তবের মিশ্রণে এই জগতের সৃষ্টিই হলো সাহিত্যিক সুকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

যে প্রেক্ষিতে যে শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত, সেখানেই সুকুমার কার্য - কারণ সম্পর্ক বজায় রেখেই অসম্ভব উপাদান, অর্থহীন শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা ননসেন্সের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়েও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। নারদ - নারদ কবিতার ভাষা ব্যবহার অসাধারণ। জোরদার শব্দ প্রয়োগের ইচ্ছা তারা হিন্দি - ইংরেজি - বাংলা মিশ্রিত কঠিন স্বরাঘাত তৈরি করে যা অন্যের কানে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। বোঝায়ায়, নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি সাহেবি সম্ভাষণের নকল করে প্রতিপক্ষকে হেয় করবার উদ্দেশ্যটা। আর এ ব্যাপারে ইংরেজি ভাষাটা চিরকালই ক্ষমতাবানের ভাষা বলেই প্রধান হাতিয়ার হয়ে এসেছে। ইংরেজি ভাষার আধিপত্য অগ্রাহ্য করার মতো হিম্মৎ ঔপনিবেশিক ভদ্রলোকেদের যে নেই এবং ইংরেজিজ্ঞানের ছাড়পত্র দাখিল করতে না পারলে যে স্বদেশেও সম্মান পাওয়া যায় না, সে সত্য তো এই শতাব্দীতেও প্রতি পদক্ষেপে প্রমাণিত। স্বকীয়তা ভুলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজ্ঞানের যে অ-ভূত - পূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে এক ভঙ্গুর 'খিচুড়িতত্ত্বে' আমরা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি সুকুমারের ব্যঙ্গের দৃষ্টি সেইদিকে পড়েছে। এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়বাদী বয়ানের বিরোধী হিসেবে সুকুমারের রচনাগুলিকে পাল্টা - বয়ান বলা যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শক্তির আওতা থেকে এক প্রচেষ্টায় পুরোপুরি বেরিয়ে আসা যায় না। তাই আরো অনেক লেখকের মতো সুকুমার রায়ও তাঁর স্বভাবের 'বৈজ্ঞানিক সাংস্কৃতিক' অসাধারণ গাম্ভীর্য সত্ত্বেও, দৃষ্টির স্বচ্ছতা সত্ত্বেও চলিত নিয়মের দাপট থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাননি। ননসেন্সের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অযৌক্তিকতাকে অস্ত্র করে আপাতযুক্তিতে আক্রমণ, যৌক্তিকতাবাদী ছকের সমালোচনা সুকুমার রায়ের লেখায় অনেকদিন ধরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৭ -এ ননসেন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই তিনি ভবিষ্যৎ রচনার আঙ্গিকের প্রতি আভাস দিয়েছিলেন ষোলোআনা বাঙালিয়ানার মোড়ক। যে উৎসাহ থেকে নিন না কেন সুকুমার ব্যবহৃত ননসেন্সের প্রিয় মোটিফ অবশ্যই বৈপরীত্য। আচরণের, সম্বন্ধের, ভাবার্থের বৈপরীত্যই এক্ষেত্রে ননসেন্সের প্রয়োজনীয় আবহটি গড়ে তুলেছে। নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া একটা ধারণা বা প্যাটার্নের অনুসারী না হলেই, বিপরীতে গেলেই তা হয়ে ওঠে অবাস্তব বা উল্টো জগতের নকসা। ননসেন্সে তাই মানুষ সজ্ঞানে বাস্তব নিয়মকানুন - যুক্তি - বিরোধী আচরণ করে। প্রথাভঙ্গকে প্রতিবাদের হাতিয়ার করতে, বৈপরীত্যকে সম্বল করে প্রথমে সামাজিক স্থিতি নাড়িয়ে দেয়, পরে আবার ঐতিহ্য মেনে চলার কথা বলে অর্থাৎ এতাবৎ মান্য সকল স্বীকৃত নিরিখের অবলুপ্তি, স্থিতির বিপরীত মেরু। ননসেন্স গল্প সেটাকেই ধরাছোঁয়ার মধ্যে, মনে রাখা যায় এমন এক রূপে, এনে দেয়। দীর্ঘকালের চর্চায় পুষ্ট ও বিধিবদ্ধ ধারা ভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে এসে কিছুটা পাল্টায়, তবে তার প্রকাশ ভঙ্গীতে মূল দর্শন অপরিবর্তিতই থাকে। গৃহীত আচরণ বিধির ব্যতিক্রম, অশিষ্টতা, অবাধ্যতা, সামাজিক থাকবন্দীর অমান্যতা অর্থে ধরা হয় ননসেন্সকে। গল্পে যতই অবাস্তব হোক, পাঠক তার সমসময়ে তাকে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, খুঁজে বার করবে প্রাসঙ্গিকতা, তার প্রাত্যহিক জগতের রূপককে। শিশুর কাছেই শুধু বাস্তব - অবাস্তব। তাই এডওয়ার্ড লিয়ার, দুই ক্যারোল, সুকুমার রায়রা শিশু সাহিত্যের মোড়কে ননসেন্সের সাহায্যে পেশ করতে চেয়েছিলেন সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। কমলাকান্তের নেশার ঘোরে করা কটাক্ষ যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঁচিয়েছিল সরাসরি সমালোচিত হবার হাত থেকে তেমনি শিশুসাহিত্যের হালকা আবরণ এই তিন লেখককে সমালোচনার হাত থেকে শুধু রেহাই দেয়নি বরং এনে দিয়েছে শিশু সাহিত্যিক হিশেবে সাফল্যের খ্যাতি। ননসেন্সের ব্যবহারে এই কারণেই এঁরা ভীষণভাবে সফল যে একাধারে এঁরা পরিবেশন করেছেন 'ছোটোদের' ও 'বড়োদের' উপভোগ্য সামগ্রী। সার্থক শিশুসাহিত্য লেখার উদ্দেশ্যও সুকুমার রায়দের মধ্যে ছিল বলেই পারিপার্শ্বিক অসঙ্গতিকে তুলে ধরেও এঁরা জীবনকে কেন্দ্রহীন, উদ্দেশ্যহীন হিশেবে দেখাননি, নঞর্থক চেতনা এখানে অনুপস্থিত। তাই ননসেন্সের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যই একে পৃথক করেছে অ্যাবসার্ড, ফ্যানটাসি, সুররিয়ালিজমের মতো খুব কাছের বর্গগুলি থেকেও। সুকুমার রায়ের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে তিনি একই সঙ্গে ধরেছিলেন কবিতা আর পাগলামিকে, খ্যাপার গানে যে কোনো মানে নেই, সুর নেই সেকথা বলবার পরেই তিনি লিখতে পারেন উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যাওয়ার মতো রোমান্টিক পংক্তি। অসম্ভবের গান করতে গিয়েও তিনি ভেতরে ভেতরে রেখে যান অসম্ভবের এক ছন্দকেও, যা তাঁকে কবি করে তুলেছে। বিশেষের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে তোলাটাই কবিতার একটা দায়। খামখেয়ালির জগতের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে কাজটা সুকুমার সহজেই করে চলেন। এই নতুন ধরনের উদ্ভট জগতের শিল্প রচনা তাই নেহাত ছেলেমানুষী নয়। এতে ফ্যানটাসি, অ্যাবসার্ড; রূপকের চরিত্র ও চেহারা মিলেমিশে এক ধরনের মিশ্রতত্ত্ব গড়ে ওঠে। আর তাতে প্রচ্ছন্নভাবে পৃথিবীর উদ্দেশ্যহীনতার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, বর্তমান বিশ্বের উদ্দেশহীন খন্ডিত পারম্পর্যহীন বেঁচে থাকাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসম্ভব কাহিনির অন্তরালে সামাজিক অসঙ্গতিকে বিদ্ধ করাই এর অন্যতম লক্ষ্য।

ননসেন্সেই সুকুমার রায়ের প্রায় সমস্ত রচনার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল কেন - এ প্রশ্নের সন্ধানে আমাদের দেখতেই হবে সমসময়কে। তাঁর পরিপার্শ্বের বিশৃঙ্খলা, অসঙ্গতিকে, আঘাত করার জন্যই ব্যঙ্গধর্মী ননসেন্স সাহিত্য রচনা করেন। এই নৈরাজ্যের প্রতি তাঁর সচেতন দৃষ্টি, তাঁর ওপর তার প্রভাব, প্রবল সামাজিক চাপ ও তার পাল্টা জবাব - সবই ধরা পড়েছিল তাঁর ১৯২২-এ লেখা 'অতীতের ছবি' কবিতায়। এর আগে 'ভাষার অত্যাচার' (১৩৬৩) প্রবন্ধেও তিনি সমাজের এক-একটা বিধিব্যবস্থার অন্যায়রকম ব্যাপকতা ও মানুষের সহজবুদ্ধির ঘাড়ে তার চেপে সার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার চেয়েও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন ১৯২০ সালের ২৩ আগস্ট বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা 'গোপন ও ব্যক্তিগত চিঠিটির মধ্যে। আবাল্য অভ্যস্ত সংস্কারের ভিত গড়ে যাওয়ায়, জন্মাবধি মেনে আসা ব্রাহ্মধর্মের আদর্শচ্যুতি ঘটায় তাঁর মনে এক নৈরাজ্যবোধের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করা যায়। সেই আত্মিক সংকটের সময়ে ক্ষুব্ধ মনের উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যই তাঁকে ঐ একান্ত চিঠিটি লিখতে হয়েছিল যা আক্ষরিক অর্থে কোনো চিঠি নয়, বরং 'মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল' হিসেবে সুকমার সাহিত্যের প্রকৃত বিশ্লেষণে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যেমন সুকুমার রচিত ননসেন্সের যথার্থ উপলব্ধি হয়, তেমনি একই সঙ্গে তাঁর ননসেন্স রচনার কারণও সন্ধান করা যায়। প্রবলভাবে কল্পনা করবার তীব্র শক্তি দিয়ে তিনি সমকালের সামাজিক, ধর্মীয়, ব্যক্তিক পটভূমিকার বিপক্ষেযেতে পেরেছিলেন। এই কারণেই ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি ও তা থেকে সৃষ্ট শিল্পকর্মের মধ্যে, তাঁর ছবিতে, লেখায় রসরূপের দ্বিস্তর উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিল, যা তাঁকে একইসঙ্গে শিশু সাহিত্যিক ও সমাজ সমালোচক হিসেবে সাফল্যের চূড়ান্ত স্থান দিয়েছিল।